মুক্তকথা

সিরাজুর রহমান

সংসদ প্রশাসন ও বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য অস্বচ্ছ মনে হচ্ছে

বায়াত্তরের বিজয় দিবসে গৃহিত বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রের তিন অঙ্গ - প্রশাসন সংসদ ও বিচার বিভাগের - পৃথক পৃথক স্বত্বা ও ভূমিকা সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত করা হয়েছে। প্রশাসন ও বিচার বিভাগের অতিমাত্রিক ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘকাল সুধী জনের অভিযোগের বিষয় ছিলো। অবশেষে সাড়ম্বরে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলেও কার্য্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দুই অঙ্গ প্রশাসন ও বিচার বিভাগের দূরত্ব সব সময় লক্ষ্য করা যাচ্ছেনা।

এখন আবার বিচার বিভাগ ও সংসদের মধ্যেকার সীমারেখা নিয়েও কিছু সংশয় দেখা দিচ্ছে। সংবিধান রচনা করেছে সংসদ। সে সংবিধান ব্যাখ্যার দায়িত্ব সর্বোচ্চ আদালতের হলেও সংবিধান সংশোধন, পরিবর্তন, এমনকি পরিবর্ধনের দায়িত্ব আদালতের নয়, সংসদের। সাত মাসের ব্যবধানে সর্বোচ্চ আদালত সংবিধানের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে বহু জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। তার ওপর যানজটের নিরসন করা জরুরী কিনা, ভাষা সৈনিকদের তালিকা তৈরী এবং কোথায় কোথায় ভাষা শহীদদের সম্মানে মিনার তৈরী করতে হবে - সেসব সম্বন্ধে মন্তব্য করে হাইকোর্ট প্রশাসনিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন বলে সাধারণ মানুষের মনে হবে।

বর্তমান সরকার সংবিধানে পরিবর্তন ঘটাতে চায়। সে অধিকার তাদের আছে। সংসদে শাসক দল তাদের 'মহাজোটের' শরিকদের ছাড়াই দুই-তৃতীয়াংশের বেশি গরিষ্ঠতা ভোগ করছে। সুতরাং সংবিধানে সংস্কার কিম্বা পরিবর্তন সাধন তাদের জন্যে খুবই সম্ভব। সে অবস্থায় সংবিধানে পরিবর্তন আনার জন্যে সরকারকে কেন আদালতের আশ্রয় নিতে হচ্ছে সেটা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়।

মূল সংবিধানের রচয়িতারা স্পষ্টতঃই একটা ধর্মনিরপেক্ষ উদার ও বহুদলীয় গণতন্ত্র সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। তাই ব্যক্তিকেন্দ্রীক কিম্বা একদলীয় শাসন অবশ্যই সংবিধানের আদর্শের পরিপন্থী। সামরিক-বেসামরিক স্বৈরশাসনকে অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করার অধিকার সংসদের আছে এবং সেটা সংবিধানের মূল আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। পঞ্চম সংশোধনীতে হাইকোর্ট সামরিক স্বৈরশাসনকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। সে রায় বহাল রাখতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট সামরিক অভ্যুত্থানকারীদের বিচার ও দন্ড দানের সোপারেশ করেছেন। তাতে কিন্তু সংবিধানের মূল আদর্শের প্রতি পুরোপুরি সুবিচার করা হয়নি। বেসামরিক পন্থায় ক্ষমতা দখল ও স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফাঁক-ফোকর থেকে গেছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে স্বৈরতন্ত্র - তা সামরিক কিম্বা বেসামরিক যে কোন পন্থায়ই আসুক না কেন - সেটা অনভিপ্রেত এবং বহু দলীয় উদার গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সংঘাত পূর্ণ। বিশ্ব ইতিহাসে বহু, বহু দৃষ্টান্ত আছে যে গণতন্ত্রকে অবাধে সক্রিয় থাকতে দেওয়া না হলে সামরিক অভ্যুত্থান অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে সেটাই ঘটেছিলো।

এ ব্যাপারটা উপেক্ষা করার মতো নয়। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী জারী করে আওয়ামী লীগ সহ সবগুলো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ও বাতিল করে দেওয়া হয়েছিলো। সরকারী মালিকানাধীন চারখানি দৈনিক পত্রিকা ছাড়া অন্য সকল পত্র-পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার আগে দ্বিতীয় সংশোধনী জারী করে জরুরী ক্ষমতা আইন চালু করা হয়। সে আইন অনুযায়ী বহু মানুষ নির্য্যাতীত হয়েছে, বিনা বিচারে অজস্র মানুষকে বন্দী করা হয়েছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংশোধনীতে জনসাধারণের বাক-স্বাধীনতা ও রাজনীতি করার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়েছিলো। গণতন্ত্রের প্রতি উচ্চতর আদালতের অনুরাগ যদি প্রকৃতই আন্তরিক হয় তাহলে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সংশোধনীকেও অবৈধ ঘোষণা করা বিচারপতিদের উচিৎ ছিলো।

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে আদালত বলেছেন যে সামরিক অভ্যুত্থান করে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়া উচিৎ। বাংলাদেশে যাঁরা সামরিক অভ্যুত্থান করেছেন তাঁদের মধ্যে জীবিত আছেন একমাত্র সাবেক লে. জে. হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে তিনি অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যার পর ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার সাময়িক ভাবে দায়িত্ব নেন এবং সংবিধানের চাহিদা অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে ১৯৮১ সালের নবেম্বরে নির্বাচন দিয়ে এবং বিপুল ভোটাধিক্যে আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. কামাল হোসেনকে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ড. কামাল হোসেন নির্বাচনী ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করেননি এবং সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ লে. জে. এরশাদও সে নির্বাচনকে ন্যায্য বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

নোটিশ দিয়ে অভ্যুত্থান

কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই এরশাদ দাবী করেন যে সশস্ত্র বাহিনীগুলোর প্রধানদের নিয়ে একটা জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করতে হবে এবং রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের ওপর ভিটো দেবার অধিকার সে পরিষদকে দিতে হবে। ১৯৮২ সালের ১৫ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি সাত্তার আমাকে এবং বিবিসিতে আমার সহকর্মী রিচার্ড ওপেনহাইমারকে বলেন যে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার ওপর ভিটো ক্ষমতা কিছুতেই কোন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদকে দেওয়া যায়না। তার পরদিন লে. জে. এরশাদের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর ভগ্নিপতি হাবিবুর রহমান আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন যে ভিটো ক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করা না হলে এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা স্বহস্তে নিতে বাধ্য হবেন। ('ঐতিহ্য' কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের স্মৃতিকথা 'এক জীবন এক ইতিহাস' দ্রষ্টব্য)। তার দু'মাস পরে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এরশাদ রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন (কারো কারো বয়ানে রিভলবারের ভয় দেখিয়ে) এবং নিজেকে রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা করেন।

সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী অবশ্যই এরশাদের 'সর্বোচ্চ শাস্তি' হওয়া উচিৎ। সপ্তম সংশোধনী বাতিল ঘোষিত হয় ২৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার। রোববার সকালে লে. জে. এরশাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরদিন তিনি রংপুরে একটি সংবাদ সংস্থাকে বলেন যে কেউই তাঁকে বিচারে দাঁড় করাতে পারবেনা। তিনি আরো বলেন যে যারা তাঁর বিচার চায় তারা উন্মাদ। স্পষ্টতঃই এরশাদ এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী হাসিনার কাছ থেকে কিছু আশ্বাস পেয়ে থাকবেন। তাঁর উক্তি স্পষ্টতঃই সুপ্রিম কোর্টের প্রতি অবজ্ঞা সূচিত করে।

সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী অবশ্যই এরশাদের 'সর্বোচ্চ শাস্তি' হওয়া উচিৎ। সপ্তম সংশোধনী বাতিল ঘোষিত হয় ২৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার। রোববার সকালে লে. জে. এরশাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরদিন তিনি রংপুরে একটি সংবাদ সংস্থাকে বলেন যে কেউই তাঁকে বিচারে দাঁড় করাতে পারবেনা। তিনি আরো বলেন যে যারা তাঁর বিচার চায় তারা উন্মাদ। স্পষ্টতঃই এরশাদ এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী হাসিনার কাছ থেকে কিছু আশ্বাস পেয়ে থাকবেন। তাঁর উক্তি স্পষ্টতঃই সুপ্রিম কোর্টের প্রতি অবজ্ঞা সূচিত করে।

এরশাদ বর্তমানে জাতীয় পার্টির একাংশের নেতা এবং সাংসদ। তাঁর দল শেখ হাসিনার 'মহাজোটের' শরিক। তাঁদের রাজনৈতিক আঁতাত আরো পুরাতন। অন্য সকল রাজনৈতিক দল ১৯৮২ সালে এরশাদের সামরিক অভ্যুত্থানের সমালোচনা করলেও আওয়ামী লীগের নতুন নেত্রী হাসিনা কোন সমালোচনা করেননি। বরং আওয়ামী লীগের মুখপত্র বাংলার বাণী পত্রিকা সম্পাদকীয় লিখে এরশাদ সরকারের সাফল্যের জন্যে মোনাজাত করেছিলো। তাঁর সরকারকে বৈধতা দেবার আশায় এরশাদ ১৯৮৬ সালের ৬ মে সংসদ নির্বাচন ডাকেন। ১৯ এপ্রিল আওয়ামী লীগ বিএনপি ও জামাতে ইসলামী একযোগে সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা সে নির্বাচন বর্জন করবে। কিন্তু সে সমঝোতা অগ্রাহ্য করে শেখ হাসিনা ২১ এপ্রিল ঘোষণা করেন যে তিনি ৬ মের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

নির্বাচনী ফলাফলে হতাশ হয়ে হাসিনা প্রথমে ঘোষণা করেন যে আওয়ামী লীগ সংসদের অধিবেশন বর্জন করবে। কিন্তু দিনদুই পরে আকস্মিক ভাবে সে সিদ্ধান্ত তিনি পরিবর্তন করেন। কারণ নিয়ে সে সময় তুমুল জল্পনা কল্পনা হয়েছিলো। হাসিনার প্রাক্তন ঘনিষ্ঠ কর্মচারী মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু তাঁর 'আমার ফাঁসি চাই' বইতে কারণ সম্বন্ধে কিছু হদিশ দিয়েছিলেন। খালেদা জিয়া গোড়া থেকেই এরশাদকে গদিচ্যুত করার আন্দোলন শুরু করেন। প্রায়ই সে আন্দোলনে শরিক না হয়ে হাসিনা পরোক্ষে এরশাদের স্বৈরশাসনকে দীর্ঘস্থায়ী হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। অন্ততঃ নৈতিকতার মানদন্ডে তিনি সামরিক স্বৈরতন্ত্রের সহায়তা করার দোষে দোষী

ব্লাক মেইল হচ্ছে কি?

এ সবের বাইরেও হাসিনার ওপর চাপ দেবার মতো আরো কিছু কার্য্যকারণ এরশাদের থাকতে পারে বলে কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আওয়ামী লীগের দুই শীর্ষ নেতা ড. কামাল হোসেন ও আব্দুর রাজ্জাককে দিল্লী পাঠিয়ে শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনেন এবং তেত্রিশ কোটি টাকার পারিবারিক সম্পত্তি তাঁকে বুঝিয়ে দেন। তার মাত্র ১৭ দিনের মাথায় জিয়া নিহত হন। এই দুটো ব্যাপারের মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে কিনা সে সম্বন্ধে তখন কিছু প্রশ্ন উঠেছিলো ও বিশেষ করে এ কারণে যে হাসিনা ও রেহানা দিল্লীতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর আশ্রয়ে ছিলেন এবং ইন্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমিতে প্রশিক্ষণ কালীন র'-য়ের কোন কোন কর্মকর্তার সঙ্গে এরশাদের সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিলো বলে শোনা গিয়েছিলো। কোন কোন মহলের মতে পরস্পরকে ব্লাকমেইল করার হাতিয়ার হাসিনা ও এরশাদের আছে।

বেসামরিক স্বৈরতন্ত্রকে সামরিক অভ্যুত্থানের মতো গ্রহণের অযোগ্য বলে ঘোষণা না করে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট অনেককে হতাশ করেছেন। তার ওপরও সরকার যদি আদালতের রায় ও আনুষঙ্গিক সোপারেশগুলো শুধুমাত্র আংশিক ভাবে কার্য্যকর করতে চায় তাহলে সাধারণ মানুষ সেটাকে আদালতের রায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো বলেই মনে করবে।

এমনিতেই আদালত ও বিচার ব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থায় চিড় ধরতে শুরু করেছে। অভিযোগ করা হয়েছে যে বর্তমান সরকারের আমলে নিযুক্ত হাইকোর্টের বিচারপতিদের কেউ কেউ আওয়ামী লীগের কট্টর সমর্থক। আইন প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটা কমিটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনায় অতীতে আনীত আওয়ামী লীগ সদস্যদের বিরুদ্ধে ছয় হাজারেরও বেশি দুর্ণীতি ও ফৌজদারী মামলা প্রত্যাহার করেছে। আদালতও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রুজু করা কয়েকটা মামলা বলতে গেলে 'পত্র-পাঠ' খারিজ করে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ এই উভয় প্রক্রিয়াকে একই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিবেচনা করবে। গতো সপ্তাহে 'রাজনৈতিকীকৃত' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সোপারেশে যেভাবে ২০০১ সালের মালিবাগ চার খুনের মামলায় এইচ বি এম ইকবাল ও সাংসদ নূরুন্নবী চৌধুরী শাওন সহ ১৪ অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের মনের সন্দেহ-সংশয় বেড়ে যেতে বাধ্য।

বিচার পদ্ধতির নিরপেক্ষতার ব্যাপারে আরো কিছু সংশয়েরও কারণ ঘটেছে। অতি সম্প্রতি আদালত অবমাননার দায়ে একজন জেলা প্রশাসক ও একজন সাবেক সচিবকে হাইকোর্ট কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। অনুরূপ অভিযোগে অনুরূপ শাস্তির কথা আগেও শুনেছি এবং আদালত অবমাননার ব্যাপারে এ রকম শাস্তিই উপযুক্ত বলে আমি মনে করি। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা গেছে আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের বেলায়। আদালত অবমাননার দায়ে তাঁকে দেওয়া হয়েছে ছয় মাসের কারাদন্ড এবং এক লাখ টাকা জরিমানা। বেশ কিছু কাল যাবৎ মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে সরকার ও আওয়ামী লীগের আক্রোশ নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে সে আক্রোশের সঙ্গে মাহমুদুর রহমানের অস্বাভাবিক কঠোর দন্ডকে পৃথক করে দেখা কঠিন হবে।

শেষ ভরসা আদালত

আজকের বাংলাদেশের মানুষ রিক্ত, নিঃসহায়। তাদের জীবনে সব কিছুই 'নাই নাই'। বিদ্যুৎ নাই, পানি নাই, গ্যাস নাই। সব চাইতে বড়ো কথা, তাদের জান-মালের কোন নিরাপত্তা নেই। আইন-শৃঙ্খলা জাহান্নামে গেছে। বাংলাদেশের নারী আজ মান-ইজ্জত নিয়ে সর্বক্ষণ মহা দুশ্চিন্তায় আছে। সরকার জনসাধারণের কোন চাহিদা মেটাতে পারছেনা। দেশের মানুষের চাইতে বিদেশী রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা তাদের বড়ো লক্ষ্য। তারা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিক্রি করে দিয়েছে বলেই মানুষের ধারণা। ক্ষমতাসীনরা, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী যে ভাষায় কথা বলেন সাধারণ মানুষের স্বভাবজাত ভদ্রতা ও শালীনতা বোধ তাতে আহত হয়। ঘৃণা ও প্রতিহিংসার রাজনীতি করবেন না বলে শেখ হাসিনা নির্বাচনের আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে প্রতিশ্রুতি পদে পদে, মুহূর্তে মুহূর্তে লংঘিত হচ্ছে।

এ সবের মাঝে মানুষের আশা-ভরসার একমাত্র অবলম্বন আদালত ও বিচার বিভাগ। আদালতের ওপরও যদি সাধারণ মানুষের আস্থা নিঃশেষ হয়ে যায় তাহলে কি নিয়ে বাঁচবে এ দেশের মানুষ? এ কথাটা মাননীয় বিচারপতিরা সর্বক্ষণ মনে রাখলে তাঁরা দেশ ও জাতির জন্যে কিছু কল্যাণ করতে পারবেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত অবৈধ ভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতিয়ে নেওয়ার জন্যে সাবেক লে. জে. এরশাদের বিচার করতে সরকারকে বাধ্য করতে পারেন। পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী তাঁরা অবৈধ ঘোষণা করেছেন। সে রায় কঠোর ভাবে মান্য করা হলে আওয়ামী লীগের সরকার এবং শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীত্ব অবৈধ হয়ে যায়। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট হয় এ দুটি সংশোধনীর ব্যাপারে তাঁদের রায় সংশোধন করতে পারেন, নতুবা একই মানদন্ডে চতুর্থ সংশোধনীটাকেও অবৈধ ঘোষণা করতে পারেন। তাতে আইন ও আদালতের ওপর জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

(লন্ডন, ০২.০৯.১০)

serajurrahman@btinternet.com